সাহানা দেবীর একটি কল্পিত চিঠি

সুশোভন অধিকারী

এটেই আমোরে সান্ত্বনা হয়ে রইলো, যাঁকে আপেনি শান্তিনিকেতনের
ইতিহাসে ঠাঁই দিলেন না, অনুচ্চারিত রয়ে গেলো
যাঁর নাম - তিনি রয়ে গেলেন আপনার লেখার জগতে
আপনার মতো বিশ্বরন্দিত লেখকের রচনায় সবার
অলক্ষ্যে গাঁথা হয়ে রইলো আমোর স্বামীর নাম,
তাঁর কাজ– এই কি আমোর কাছে কম পাওয়া।

শ্রীচরণেশু রবিকামশায়,

আমি সাহানা, আপনার স্নেহের ভাইপো বলুর ভাগ্যহীনা স্ত্রী। জানি না, আজ হঠাৎ কি মনে করে, জীবনে এই প্রথম নিজে থেকে আপনাকে একখানি পত্র লিখতে বসেছি। এর আগে আপনাকে কখনো এভাবে চিঠি লিখিনি। আপনাকে পত্র দেবার দরকার পড়ে নি। সংসারিক প্রয়োজনে আপনার পত্রের উত্তর দিয়েছি মাত্র। আজও যে খুব দরকার তা না, তবে কেন জানি মনে হলো আপনাকে কিছু লিখি, তা বসেছি। তবে কেবল আপনিই নন, উনি ছাড়া আমার শ্বশুরবাড়ির অন্য কোনো গুরুজনের কাছে আমি কোনো পত্র লিখি নি। বিশেষ করে আপনার মতো জগৎবিখ্যাত মানুষকে চিঠি লেখা তো সহজ কথা নয়। তাই মনের মধ্যে অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে অতিকষ্টে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছি। লিখতে গিয়ে যদি কোনো অপরাধ করে থাকি–আমাকে মার্জনা করবেন। আমার পরম পূজনীয় স্বামী, আপনার প্রিয় ভাইপোকে আপনি তো অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমার শ্বাশুড়িমায়ের কাছে শুনেছি, ছেলেবেলায় আপনিই তাঁকে সাহিত্যের পথে সঠিকভাবে এগিয়ে দিয়েছিলেন। এবং সে ব্যাপারে আপনার কত সজাগ দৃষ্টি ছিলো। মানুষ হিসেবেও অমন কোমল মনের মানুষ সচরাচর দেখা যায় কিনা জানি না। কিন্তু কোন্ অপরাধে, আমার কোন্ পাপে বিধাতা আমাকে এমন শাস্তি দিলেন! কেন তিনি অসময়ে এ ভাবে আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন? আমার পরম স্নেহশীল শ্বাশুড়িমায়ের কোল শূন্য করে, আমাদের সকলকে ছেড়ে কেন তিনি গেলেন? ভাইপোর প্রতি আপনার স্নেহ ও আদরের অনেক কথা শুনেছি। সেই স্নেহপ্রীতির দাবীকে মনের মধ্যে স্মরণ করে কিছু কথা এখানে জানাতে চাই। পুনরায় বলে রাখি। যদি কোনো ভুল করে থাকি তাহলে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার ক্ষীণ সুতোটা বাঁধা থাকলেও, একদিক থেকে যে আমি এক সাধারণ বাড়ির মেয়ে–তা বলতে কোনো বাধা নেই। তবু আজ আমার চারদিক কেমন অচেনা ঠেকে, এ বাড়ির সবাইকে যেন বহুদূরের মানুষ বলে মনে হয়। মনে হয়, আমাকে বুঝি আবার নতুন করে আপনাদের কাছে পরিচয় দিতে হবে। মাঝে মাঝে নিজেকেই প্রশ্ন করি, করুণাময় ঈশ্বর কেন আমাকে এত কঠিনতম শাস্তি দিলেন?

আমার চিকিৎসক পিতা ফকির চাটুজ্যে বেশ সহৃদয় ভালোমানুষই ছিলেন। আপনার ভাইপোর সঙ্গে যখন আমার বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স বোধহয় বারো-তেরো বছরের মতো। উনি অবশ্য আমার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড় ছিলেন, প্রায় তেরো - চোদ্দো বছরের হবে। এ নিয়ে আমার মনের মধ্যে বেশ ভয় ছিল। তার ওপরে আমার গায়ের রঙ ছিল একটু শ্যামলা, হয়তো এই কারণে আমার বিবাহ বিষয় আমার বাপ-মায়ের মনে কিছু দুশ্চিন্তা ছিলো। এবং কালো রঙের জন্য আমার মনেও যথেষ্ট সঙ্কোচ ছিলো। আর বাঙলার বাইরে এলাহাবাদে বসবাসের কারণে আমার মনে আরো একটা ভয় জমা হয়েছিলো। আমি বাঙালার জীবন তার সাংসারিক রীতিনীতি কিছউ ভালো করে জানি না। সেসব ঠিকমতো মেনে চলতে পারবো তো! কিন্তু বিয়ের পর এ বাড়িতে এসে একদিনের জন্যেও সে সঙ্কোচ সেই ভীতি আমি অনুভব করিনি। এ বাড়ির সবাই এমন স্নেহে আদরে আমাকে গ্রহণ করলেন যে আমার মনের সে সকল সঙ্কোচ একেবারে মুছে গিয়েছিলো। বিশেষ করে ছোটোকাকিমার কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না। তিনি যে আমাকে কত সাহস জুগিয়েছিলেন তা বলার নয়। তাঁর মুখখানা মনে পড়লে আমার চোখদুটো আজও জলে ভরে যায়। আসলে তিনি তো আমার চেয়ে আরো ছোটো বয়সে খুলনার সেই ফুলতলা গ্রাম থেকে এই জমকালো ঠাকুরবাড়িতে এসে পড়েছিলেন। বোধহয় আমার মনের ভেতরের কথাগুলো তিনিই বুঝেতে পেরেছিলেন সবচেয়ে বেশি। মনখারাপ হলে আমাকে খুশি করতে তাঁর ফুলতলা গাঁয়ের কত রকম গল্প যে তিনি আমাকে শোনাতেন তা বলে শেষ করা যায় না। আর আমি একটু ভয় পেলে কাকিই আমার মনে সর্বদা সাহস জোগাতেন। তারপর বিশেষ করে উনি যখন চলে গেলেন–আমি ভালো করে কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই–সেই সময়ে ছোটোকাকির কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না। উনি অমন করে চলে যাওয়ায় ছোটোকাকিমা নিজেও তো কম আঘাত পান নি। ছোটোকাকির প্রতি ওনার শ্রদ্ধাপ্রীতির যে কী গভীর সম্পর্ক ছিলো, তার কিছু কিছু আমি তো শুনেছি! কিন্তু ছোটোকাকি অত্যন্ত শক্ত করে নিজের দুঃখ চেপে রেখেছিলেন, আমার সামনে কখনোও প্রকাশ করেন নি। তাঁর সেই স্নেহের সান্ত্বনা আমার আজীবন মনে থাকবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, ছোটোকাকি নিজেও কত তাড়াতাড়ি আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন!

কেন এমন হয় রবিকামশাই? যাদের আমরা সবচেয়ে ভালোবাসি, যাদের ওপর সব থেকে নির্ভর করে বসি–তাঁরা সবাই এমন অসময়ে আমাদের ছেড়ে চলে যান কেন? তাহলে আমরা কি নিয়ে বাঁচবো! একি তবে আমাদের এক রকমের পরীক্ষা, করুণাময় ঈশ্বরের এ কেমনতর পরীক্ষা রবিকামশাই?

উনি চলে যাবার পর আমাকে যখন আবার এলাহাবাদে ফিরে যেতে হলো। সে দিনের কথা মনে পড়লে আজও আমি ডুকরে কেঁদে উঠি। এলাহাবাদের বাড়িতে আবার ফিরে যাওয়ার আগেই আমার পিতা গত হয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে মনে হলো সেই বাড়ি আমাকে যেন গ্রাস করতে চাইছে। বার বার মনে হতো, সুখস্বপ্নের মতো আমার এই সামান্য তিনটে বছর আমি কোন্ অভিশাপে এভাবে হারিয়ে ফেললাম! আমার মা আমাকে সান্ত্বনা দিতে এলে আমার দুঃখ যেন আরোও দ্বিগুণ করে বুকে এসে বাজতো । মনে পড়ে, কি এক আতঙ্কে তখন আমি আয়নার সামনে দাঁড়াতে পারতাম না, নিজেকে মনে হতো রাক্ষসী, ডাকিনী। মনে হতো, আমারই কোনো পাপে অমন দেবতার মতো স্বামীকে আমি হারিয়ে ফেলেছি, সর্বস্ব খুইয়ে বসে আছি। বাপের বাড়িতে আমার নাম ছিলো সুশীলতা। জোড়াসাঁকো বাড়িতে আর সব বৌয়ের মতো আমাকে

দেওয়া সেই নতুন নাম 'সাহানা'—আমি মনে মনে মুছে ফেলতে চাইতাম। রাগে দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে আমি কখন যে কি করে বসতাম জানি না। অথচ ও বাড়িতে আমার প্রিয় মানুষদের জন্যে আমার মনটা সব সময় কেঁদে বেড়াতো। একেকবারে মনে হতো এলাহাবাদের বাড়ি ছেড়ে আমি জোড়াসাঁকোয় পালাই। কিন্তু তাও কি আর সম্ভব ছিলো! আমি বোধহয় একটু বেশি মাত্রায় সরল ছিলাম, যখন যে যা বলেছে তাই সরল মনে বিশ্বাস করে বসতাম। কত রকমের ঠাট্টা যে আমি সত্যি বলে ভেবে বসতাম, সে সব ভাবলে আজ হাসি পায়, আবার অজান্তে চোখের কোলটুকু ভিজে ওঠে। ও বাড়িতে ছোটোদের দলের সঙ্গে কত ছুটোছুটি খেলা করেছি, বধু বলে কেউ আমাকে বাধা দেননি— আর শ্বাশুড়িমা তো কখনোই নয়। আপনি তো জানেন, আমার স্বামীর পায়ে একটু অসুবিধা ছিলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও উনিও মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে খেলায় যোগ দিতেন। এলাহাবাদের বাড়ির নিস্তব্ধ দুপুরে সেই সব কথা মনে করে আমি যে কি কষ্ট পেয়েছি তা বোধহয় কেবল ঈশ্বরই জানেন।

কি করবো রবিকামশায়, আমি তো আর ওনার মতো বা আপনার মতো কবিতা লিখতে জানিনা, তাহলে হয়তো আমার মনের দুঃখভার কিছুটা লাঘব হতে পারতো। কিন্তু কি লিখবো আমি, চোখের জলের ধারায় আমার সমস্ত জীবন যে তখন ধুয়ে যাচ্ছিলো। আমি আজ বুঝতে পারি, ছোটোকাকি চলে যাওয়ার পরে কি ভাবে দিনগুলো কেটেছিলো আপনার। আর কি আশ্চর্য ঘটনা দেখুন, ঊনত্রিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই উনি চলে গেলেন। আবার ওঁর সঙ্গে সবচেয়ে স্নেহের সম্পর্ক ছিলো যে মানুষটির— সেই ছোটোকাকিমাও ঠিক অমনি ঊনত্রিশ বছরের আগেই ঐ একই বয়সে চলে গেলেন! বয়সের দিক থেকে মৃত্যুতেও কি মিল ছিলো ওঁদের, তাই না রবিকা? পাগলের মতো মাঝে মাঝে আমার মনে হতো, স্বর্গে কি ওঁদের মধ্যে কখনো আবার দেখা হয়েছে। আচ্ছা রবিকা, স্বর্গ বলে সত্যিই কি কিছু আছে?

মনে পড়ে, উনি চলে যাবার পর জোড়াসাঁকো থেকে ফিরে প্রায় বছর খানেক আমি এলাহাবাদের বাড়িতে ছিলাম। ইতিমধ্যে আমার অবস্থা দেখেশুনে ভীত হয়ে বাপের বাড়ির লোকেরা পুনরায় আমার বিবাহের চেষ্টা শুরু করেছে। পিতার অবর্তমানে আমাকে নিয়ে আমার অসহায় মা তখন খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। পড়ে শুনেছি, আমার বিবাহের চেষ্টার খবরে জোড়াসাঁকোয় নাকি কানাকানি শুরু হয় এবং বাড়ির কর্তামশায় স্বয়ং মহর্ষি এ বিয়েতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তার কারণ আমি জানি, সেকালের আদি ব্রাহ্মসমাজে বিধবা বিবাহের অনুমোদন ছিলো না। আর জোড়াসাঁকো বাড়িতে কর্তমশায়ের কথাই তো ছিলো একেবারে শেষ কথা। আমার ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন, মহর্ষির কোনো ছেলেই তাঁদের পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কথা কোনোদিন বলতে পারেন নি— তা সেটা উচিত বা অনুচিত যাই হোক না কেন! আর আমার দ্বিতীয় বিয়ের চেষ্টাকে বাতিল করে আমাকে জোড়াসাঁকোয় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সেই গুরদায়িত্ব তো আপনার কাঁধেই বর্তেছিলো। এও শুনেছি, জোড়াসাঁকো বাড়িতে সকলে বেশ ভয় পেয়েছিলেন আমার ফিরে আসার ব্যাপারে। আপনি নিজেও কিছু কম চিন্তিত হয়ে পড়েন নি— সেও আমি পরে জেনেছি। কিন্তু আমি তো সহজেই ফিরতে রাজি হয়েছিলাম রবিকামশাই! আমার অসহায় মা পর্যন্ত আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেন নি। সত্যি কথা বলতে আপনারা মিছেই অমন ভয় পেয়েছিলেন রবিকা। আজ বলতে বাধা নেই, উনি চলে যাবার পরে আমাদের প্রতি জোড়াসাঁকো বাড়ির একটা অবহেলা আর উদাসীনতার ভাব সত্ত্বেও আমার মনটা যে ওখানেই পড়ে থাকতো, সে কথা আমি আপনাদের কি করে বোঝাবো? আমার দ্বিতীয়বার বিবাহের কথাবার্তার সবটুকুই আমার কাছে অনেকটা দুঃস্বপ্নের মতো বোধ হচ্ছিলো, এই বিয়েতে আমার মত এবং অমত কোনোটাই আমার মনকে স্পর্শ করতে পারছিলো না। এ থেকে আমার মনটা অনেক দূরে সরে গিয়েছিলো। নিজের চেয়েও তখন আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম আমার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। ইতিমধ্যে আপনি আমাকে ফিরিয়ে আনতে এলাহাবাদে পৌঁছালেন, আর সেই মুহূর্তে মনে হবো আমি বুঝি এ সবের থেকে মুক্তি পেলাম। কিন্তু সত্যিই কি আমার মুক্তি ঘটেছিলো রবিকামশায়? আমার নিজের কথা আর কি বলবো রবিকা! আমার শ্বাশুড়ি মা, আপনার নবৌঠান দুঃখ পেয়েছেন আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশি। একদিকে পুত্রশোক আর অন্যদিকে উন্মাদ স্বামীর সঙ্গে আমি দুর্ভাগ্যের প্রতিমূর্তির মতো তাঁর একমাত্র পুত্রবধূ—এসে জুটেছিলাম আমার সমস্ত দুঃখকষ্টের ডালি নিয়ে। সেই মানুষটি তবু কি আশ্চর্য রকমের নিজের ভাগ্যের সঙ্গে প্রতি নিয়ত লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আপনারা জোড়াসাঁকো বাড়ির প্রায় সকলেই প্রত্যেক মুহূর্তে তাঁকে ভুল বুঝেছেন। এমন কি আপনিও তাঁর মনের কথা কখনোও তলিয়ে বুঝতে চান নি রবিকা! উপরন্তু, আমার স্বামী চলে যাবার পর আমার শ্বাশুড়িমা বিষয় সম্পত্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় আপনি ধিক্কারের সুরে বলেছিলেন—নবৌঠানের এক ছেলে, সংসারের একমাত্র বন্ধন ছিন্ন হয়েছে তবু তিনি টাকাকড়ি কেনাবেচা নিয়ে দিনরাত্রি যে রকম ব্যাপৃত হয়ে আছেন তাই দেখে সকলেই আশ্চর্য ও বিরক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সত্যিই আপনি ভালো করে ভেবে দেখেছিলেন— ওই মানুষটি অমন নির্মম শোকাতুর অবস্থার মধ্যেও বিষয় সম্পত্তির কথা কেন ভাবতে বাধ্য হচ্ছিলেন, সে কি তাঁর নিজের জন্যে? উনি চলে যাবার পর আমার উন্মাদ শ্বশুর মশায়ের বংশধারা আর বজায় রইলো না বলে মহর্ষি তাঁর বিষয় সম্পত্তি থেকে আমার শ্বাশুড়িকে কি বঞ্চিত করেন নি? জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তো এই নিয়মই বজায় ছিলো যে, নিঃসন্তান ও পুত্রহীন সদস্যেরা যাবতীয় স্থাবর ভূসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। জ্যোতিকামশায়েরও এই দশা হয়েছিলো বলে শুনেছি। এমন কি আমি একথাও শুনেছি, কর্তাদাদামশায়ের ছোটো ভাই নগেন্দ্রনাথের অবর্তমানে তাঁর নিঃসন্তান স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরীকে তিনি সর্বতোভাবে বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। একইভাবে আমার শ্বাশুড়িমাকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে কেবল মাসোহারা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিলো—এতো আপনারা সকলেই জানেন। ট্রাস্টির দেওয়া ওই একশো টাকায় একজন উন্মাদ রোগীর চিকিৎসা, শোকাতুর অসুস্থ পুত্রবধূ আর তাঁর নিজের কি ভালে চলবে, সে কি আপনারা একটু বিবেচনা করে দেখেছিলেন? সেই ট্রাস্টির অন্যতম সদস্য হিসাবে আপনিও তো ছিলেন, এইটে কি ট্রাস্টির নেহাৎ অবিবেচকের মতো কাজ হয় নি? আপনারা কেবল নিজেদের দিকটাই ভেবেছেন। এমন কি ছোটোকাকির তখন অসুখ, আপনি আমাকে একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন, আমার শ্বাশুড়ির ভাবে আপনার মনে হয় যে আপনাদের ব্যবহার হিসাবপত্র তিনি নেটাতে চান না, গোলমাল পাকাতে ইচ্ছা করেন। এ কিন্তু আপনার নিতান্তই ভুল ধারণা ছিল রবিকা, পরে তো দেখেছেন, এ নিয়ে কখনোই কোনো অনর্থক গোলমাল বা ঝঞ্ঝাট তৈরি হয় নি।

আর একটা গভীর খেদের কথাও এখানে জানিয়ে রাখি। আজ আর সে সব বিষয়ে কোনো লজ্জা কোনো সংকোচ আমার নেই, আপনার কাছে প্রকাশ করতেও কোনো বাধা নেই। আমরা তখন শিলাইদহে আপনদের সঙ্গে বেশ আনন্দে আছি। যদিও ওনার শরীর খারাপের দিকটা আমি অত ভালো করে বুঝতে পারিনি, আর উনি এত চাপা স্বভাবের ছিলেন, মুখ ফুটে আমাকে কিছু বলতে চাইতেন না, ছেলেমানুষ বলে পাচ্ছে

আমি কষ্ট পাই। কিন্তু ওই শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও আপনাদের ব্যবসাপত্রের হিসেব নিয়ে তাঁকে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখতাম। তারপর অসুখ আরেকটু বাড়াবাড়ি হলে রথী আর ওঁর চিকিৎসার জন্য আপনি ওঁদের কোলকাতায় নিয়ে গেলেন। ঠিক সেই পর্বে তো আরো কটা দিন আমি শিলাইদহে ছোটোকাকির কাছে রইলাম। সেই সময়ে আমি যে আমার মধ্যে মাতৃত্বের আভাস পেয়েছিলাম। কাকিমাই ঘটনাটা বুঝিয়ে আমাকে সাবধান করেছিলেন। মনে আছে একদিন রাতে আমি বেলির কাছে শুয়েই, কেন জানি না, সেদিন আমার শরীরটা বেশ খারাপ ছিলো। রাত্রে কয়েকবার বলি করতে দেখে বেলি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, ছেটোকাকিও একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তারপর একটু সামলে নিতে কৃতীর সঙ্গে আমি জোড়াসাঁকোয় ফিরেছিলাম। এ অবস্থায় আমাকে পাঠাতে ছোটোকাকিমা বড় ইতস্তত করছিলেন, আমিই বরং জোর করে ফিরেছিলাম। সে দিনটা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে! এই অবস্থায় ফিরে জোড়াসাঁকোতে ওঁর কাছে এসে দাঁড়াতে আমার যে কি এক বিশেষ অনুভূতি হয়েছিলো– তা আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না। উনি বোধহয় আমার চোখের দৃষ্টিতে আমার ব্যবহারে কিছু একটা আঁচ করেছিলেন। অসুস্থ অবস্থাতেও ওনার আরক্ত মুখে যেন একটা আলো জ্বলে জ্বলে উঠেছিলো, সে আমি বেশ টের পেয়েছিলাম। অবশ্য তারপরে উনিই তো আর বেশিদিন রইলেন না, আমার মাতৃত্বের সাধ– সে আর এ জীবনে পূরণ হয়নি! তবু সেই সব ছোটোখাটা অনুভূতি, সেই সব ছোটো ছোটো সুখস্মৃতির মালা গেঁথে, সেই সব স্মৃতি আঁকড়ে আজও আমি বেঁচে আছি রবিকা।

রবিকামশাই, আমি সবচেয়ে বড় আঘাত কখন পেয়েছিলাম জানেন? যখন শান্তিনিকেতনের ইস্কুলে পড়বার সুযোগে থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন। আর সেই নিষ্ঠুর আঘাত তো আপনার কাছ থেকেই এলো! অথচ দেখুন, আমার শ্বাশুড়িমা আমার লেখাপড়ার চেষ্টায় কখনো কোনো বাধা তো দেন নি, বরং বিপুল উৎসাহ জুগিয়েছেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ি মেয়ে বউরা সকলে মহর্ষির সময় থেকে ইস্কুলে গিয়েছেন। শ্বাশুড়িমাতাও আমাকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে সাবলম্বি করে তুলতে চেয়েছিলেন। এবং সেই কারণে আমাকে বিলেতেও পাঠাতেও তিনি পিছ-পা হন নি। মন আছে, সরলাবালা মিত্র জলপানি নিয়ে আমি যেবার বিলেত গিয়েছিলাম– সেবার আমার যাত্রার সঙ্গী হয়েছিলেন কুচবিহার রাজবাটির দুই কন্যা প্রতিভা আর সুধীরা। কিন্তু আমি বেশিদিন সেখানে থাকতে পারি নি। বিলেতের পরিবেশ ও আহারাদি আমার দুর্বল স্বাস্থের তেমন অনুকূল হয় নি। বিলেতে আমার শরীর আরো খারাপ হওয়ায় আমি ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। ফিরে এসে শরীর একটু ভালো হবার পর আবার পড়াশুনায় মন দিলাম, তার পাশাপাশি চলতে লাগলো আমার সেলাই শেখার কাজ। আমার শ্বাশুড়িমা আমার কোনো কাজে বাধা দেন নি। এমন কি উনি আমাকে সংসারের কাজকর্মও করতে দিতেন না, সকল সময়ে আমাকে আগলে রাখতেন।

কিন্তু আপনি কেন আপনার আশ্রমের ইস্কুলে আমাকে ভর্তি নিলেন না রবিকা?

আমার চিঠির উত্তরে আপনি কি আশ্চর্য রকম লিখলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়ে সায়েন্স পড়াইবার সুবিধা আছে বটে কিন্তু বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটারিতে তোমাকে শিক্ষা দিতে গেলে সকলের সামনে তোমাকে বাহির হইতে হইবে– সে কি সম্ভব হইবে?' জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বউরা তো পর্দার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন সে কোন কালে! লেখাপড়া ছাড়াও তাঁরা প্রায় সকলেই গানে নাটকে অভিনয় করেছেন, মেজোবৌঠান তো ছোটো ছেলেমেয়ে নিয়ে একা একা বিলেত পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছেন, আর শুনেছি নতুন বৌঠান জ্যোতিকামশায়ের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেরোতেন। অথচ এতদিন বাদে আমার বেলা আপনার এই নিদান! সে কি আমি স্বামীহীনা এক অসহায় মেয়ে বলে! আর মেয়েরা কি আপনার ওখানে বিজ্ঞান পড়তো না, তাদের বিজ্ঞান পড়ায় কি কোনো নিষেধ ছিলো? নাকি সে ছিলো নেহাত আমাকে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে পড়তে না দেওয়ার অছিলামাত্র। কিন্তু আপনার নিজের মেয়েরা– বেলি, মীরা বা রেণুকার বেলায়ও আপনি এ কথা বলতে পারতেন? এমনকি বিবির বেলায়! না, আমি জানি আপনি এ কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু আমার ইচ্ছাটাকে আপনার কলমের এক খোঁচায় বাতিল করতে আপনার একটুও বাধেনি।

আমার ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন রবিকা, কারণ আর একটা কথাও এখানে না বলে পারছি না। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে আমার কি কোনো অধিকার ছিলো না। আমার তো মনে হয়, সে অধিকার আমারই ছিলো সবচেয়ে বেশি। কারণ ওই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পরিকল্পনা তো আমার স্বামীর। তিনিই তো মহর্ষির অনুমতি নিয়ে ওখানে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আপনি শিলাইদহে ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে ইস্কুল তৈরির কথা ভাবলেও শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আপনার সেই ভাইপো, আমার অকালমৃত স্বামী– সে কথা আপনার চেয়ে বেশি আর কে জানে? উনি গত হলে শান্তিনিকেতন প্রায় শূন্য অবস্থায় এমনিই পড়ে ছিলো। পুনরায় মহর্ষির অনুমোদনে আপনি সেখানে ব্রাহ্মচর্যাশ্রম খুললেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, আপনারা কেউই কোথাও স্বীকার করলেন না আমার স্বামীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা! আপনাদেরই পরিবারের একজন, যিনি প্রতিভার নিজগুণে মহর্ষিসহ আনাদের সকলের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁর অকালমৃত্যু এভাবে সকলের মন থেকে তাঁকে মুছে ফেলবে–এ আমি ভাবতেই পারিনি। আমি, আমার শ্বাশুড়িমা আপনাদের কাছে এরকম করুণার পাত্র ছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার স্বামীর কীর্তিকে মুছে দিতেও আপনাদের এতটুকু বাধলো না?

না রবিকা, আর অভিযোগ জানাবো না। এবার অন্য কথা বলতে চাই। আমি আপনার নতুন উপন্যাসখানা সংগ্রহ করেছি। হ্যাঁ, আমি ঘরেবাইরে বইটির কথা বলছি। যদিও সেই বইখানা পড়ে তার সবটুকু বুঝতে পারিনি, তবে এটুকু বুঝেছি–ওখানে নিখিলেশের মধ্যে আপনি আমার স্বামীর স্বভাব, মনের ভাবনা আর তাঁর কাজকে মিশিয়ে দিয়েছেন। এমন কি দাঙ্গায় তাঁর আহত হবার ঘটনাটাও আপনি ওই বইতে কি নিপুণ ভাবে তুলে এনেছেন! ঐটেই আমার সান্ত্বনা হয়ে রইলো, যাঁকে আপনি শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে ঠাঁই দিলেন না, অনুচ্চারিত রয়ে গেলো যাঁর নাম– তিনি রয়ে গেলেন আনার লেখার জগতে। আপনার মতো বিশ্ববন্দিত লেখকের রচনায় সবার অলক্ষ্যে গাঁথা হয়ে রইলো আমার স্বামীর নাম, তাঁর কাজ– এই কি আমার কাছে কম পাওযা! আমার শরীর ভালো নেই রবিকা, মাঝে মাঝেই কাশি হয়, বুকে কেমন হাঁফ ধরে। বায়ু পরিবর্তনের জন্য আমার বাইরে বেরোতে ইচ্ছে হয়েছে। বড় সাধ, একবার কাশ্মীর বেড়িয়ে আসি। আমার শ্বাশুড়িমাও সম্মতি দিয়েছেন, ফুলপিসীমার ছেলে সরোজদের সঙ্গে চলেছি। আমাকে আশীর্বাদ করুন আমার যাত্রা যেন শুভ হয়।

ইতি, আপনার স্নেহচরণাশ্রয়ছিন্ন অধম সাহানা।